অনন্ত নক্ষত্রবীথি

মৈত্রীশ ঘটক

‘বড়দিন’ বড় কেন? যিশুখ্রিস্টর জন্ম এবং তার যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্বাসীদের কাছে রয়েছে, সেই আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও, এর বৃহত্তর প্রতীকী অর্থ হল পরিবর্তনের, নতুন সূচনার প্রতিশ্রুতি। শীতের দীর্ঘতম রাতের গহ্বর থেকে নতুন দিনের, নতুন ঋতুর, নতুন জীবনের উন্মেষের জন্য প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি। আমাদের জীবনেও এরকম ছোট-বড় ‘বড়দিন’ আসে, জীবনের মোড়-ঘোরানো কোনও অধ্যায় বা সময় পর্ব, যা জীবনের পথচলা বদলে দেয়। অনেক পরে ফিরে তাকালে মনে হয়, সেই আগের আমি আর পরের আমি যেন সম্পূর্ণ আলাদা দুই মানুষ, অথচ তাদের একজন থেকেই আর-একজনের জন্ম হয়েছে, তাই তাদের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড় আবার জটিল। যখন এই উত্তরণ হয়, অনেক সময়ই সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয়, ভেতরে-বাইরে ভেঙেচুরে অনেক কিছু পাল্টানোর সময়, অনেক কিছু হারানোর সময়, মানচিত্রহীন, নির্দিষ্ট গন্তব্যহীন এলোমেলো হাঁটার সময়। তাই তাকে উৎসবের দিন হিসেবে ভাবতে গেলে, এমনকী, জীবনের একটা ‘বড়দিন’ বলে ভাবতে গেলেও অনেকটা সময়ের প্রলেপ লাগে, অনেকটা নিরাপদ দূরত্বের নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাতের দরকার হয়, যেমনভাবে ঐতিহাসিকরা অতীতের দিকে তাকান। আত্মানুসন্ধানের এই প্রবণতা প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি আছে, যার সূত্র টানা যায় জ্ঞানচর্চার সেই পুরনো মন্ত্রে,

আমার অঙ্ক ভাল লাগার আসল কারণ অঙ্ক আমাকে এমন একটা ভাষার সন্ধান দিল, যাতে আপাত-পিচ্ছিল ও বিভ্রান্তিকর নানা ধারণা ও বক্তব্য আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিভাত হয়ে উঠতে থাকল।

অ্যাডোরেশন অফ দ্য মেজাই। ১৬৩২। রেমব্র্যান্ট

মণীশ ঘটক

‘আত্মানাং বিদ্ধি’। কিন্তু ‘আত্ম’ তো মানচিত্রে কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নয় যে, ঠিকানায় পৌঁছে তার অন্ধিসন্ধি জানা হয়ে গেলে কাজ শেষ। আত্মানুসন্ধান স্বভাবতই এক পথ-পরিক্রমা। সময়ের নিপুণ তুলি আমাদের স্মৃতি এবং চেতনায় জটিল আঁচড় কাটে।

তাই ‘স্মৃতিচারণ’ ব্যাপারটা কখনওই নিরপেক্ষ হয় না, তা মনে রাখা, ভুলে যাওয়া এবং কল্পনার এক রহস্যময় মিশেল। ভাবুন— পৃথিবী পাল্টাচ্ছে, আপনি পাল্টাচ্ছেন, আশপাশের সবাই পাল্টাচ্ছে, আমরা কী মনে রাখি আর কী ভুলে যাই— তার নিশ্চয়তা নেই, এবং কীভাবে অতীতকে দেখি তা আমাদের বর্তমান অবস্থান ও মনোজগতের হালের ওপর নির্ভর করে, এবং মাথার মধ্যে কাজ করে যায় ‘স্মৃতি সততই সুখের’ এবং ‘যা হয় তা ভালর জন্যই হয়’— এই ধরনের স্লোগানধারী নির্মম সম্পাদক। তাই, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যেও নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, নিত্য পরিমার্জন চলতে থাকে।

তাই, জীবনের কোনও কোনও ঘটনায় আমাদের যাত্রাপথ পাল্টে গেলে, পরে যখন আমরা সেই পথচলার স্মৃতিচারণ করি, তাতে এক ধরনের পক্ষপাত এসে পড়তে বাধ্য। আমরা বর্তমানের বারান্দা থেকে যখন অতীতের দিকে তাকাই, বিভিন্ন সময় আমরা অনেকগুলো দিকেই চলে যেতে পারতাম। সেই বিকল্প যাত্রাপথগুলো কী হতে পারত, তা ঠিকমতো ভেবে উঠতে পারি না। আর যখন ভাবি, তখন আক্ষেপ (‘আহা, তখন যদি ওটা করতাম বা এটা হত!’) আর তৃপ্তির (‘ভাগ্যিস তখন সেটা করেছিলাম বা ওটা হয়েছিল!’) এক দোলাচল হয় মনের মধ্যে।

এই সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেও কিছু কিছু মোড়-ঘুরে-যাওয়া সময় আসে জীবনে— যা বাস্তব জীবনের দিনলিপিতে মুহূর্ত, দিন, মাস, বা বছরের মাপকাঠিতে হয়তো পরিচ্ছন্ন করে ধরা যায় না, কিন্তু আমাদের স্মৃতিচারণের দিনলিপিতে ‘বড়দিন’-এর মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

আক্ষরিক অর্থে তা হয়তো বিশেষ কোনও একদিন নয়, বিশেষ কতকগুলো মুহূর্ত চিহ্নিত করা যায়, যখন এক আমি থেকে নিজের অজান্তে আরেক আমি হয়ে যাই আমরা। তবে শুধু বড়দিন কেন, জন্মদিন থেকে শুরু করে নববর্ষ বা স্বাধীনতা দিবস— এই সবগুলোরই তাৎপর্য তো মূলত প্রতীকী। এদের নেপথ্যে আছে এক দীর্ঘতর যাত্রাপথ, এবং এদের উদ্‌যাপনের মধ্যে আছে ভবিষ্যৎ নিয়ে এক প্রতিশ্রুতি এবং প্রস্তুতিপর্ব। বড়দিনের ধারণাটার মধ্যেও এই প্রতীকী দিকটাকে স্বীকার করে নেওয়া আছে।

ব্যক্তিগত জীবন সরিয়ে রেখে আমার চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিচর্চার জীবনের দিকে দেখলে এরকম ‘বড়দিন’ চিহ্নিত করতে পারি কতকগুলো। তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ‘বড়দিন’ হল চেতনার উন্মেষ হওয়ার পরে মূলত সাহিত্য, রাজনীতি এবং দর্শনের জগতে তন্ময় কৈশোর কাটিয়ে হঠাৎ একদিন গণিত ও পরিসংখ্যানের জগতে ঢুকে পড়া। তখন মনে হত, কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মতো যেন এক অন্য গ্রহে এসে পড়েছি, অথচ তার আকর্ষণ কাটিয়ে পরিচিত পৃথিবীতে ফিরতে পারছি না। তারপর ধাপে ধাপে অর্থনীতিকে বিষয় হিসেবে বেছেছি, সেই বিষয়ে গবেষণার জগতে প্রবেশ করেছি, আবার সেখান থেকে মধ্যজীবনের অমোঘ শিকড়মুখী মাধ্যাকর্ষণী টানে লেখালেখির জগতে ফিরেছি। প্রবন্ধ বিষয়টা ‘সাহিত্য’ কি না, জানি না, কিন্তু বাংলা অক্ষর লেখার, বাংলা শব্দের চুম্বক টান থেকে কিছুদিন পেশাগত চাপে সরে থাকলেও, সে-ই ঘরে ফেরা হয়তো অবধারিত ছিল। সে আর-এক গল্প।

এখনও ভাবলে কৈশোরের সেই অন্তর্জগৎ আমূল পাল্টে যাওয়ার পর্যায়ের কথা মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মোড়-ঘোরানো ‘বড়দিন’।

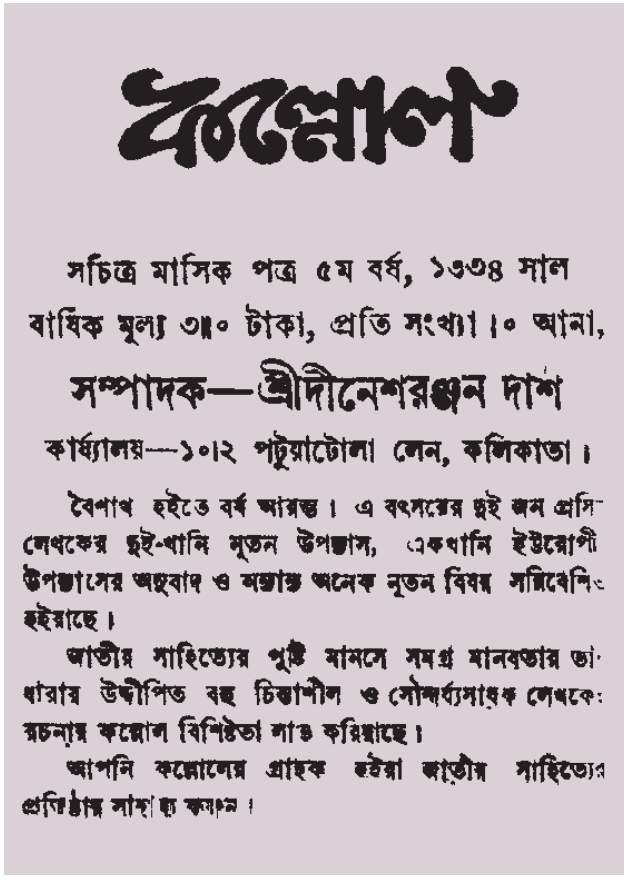
কল্লোল

সচিত্র মাসিক পত্র ৫ম বর্ষ, ১৩৩৪ সাল

বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা,

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কার্য্যালয়—১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

বৈশাখ হইতে বর্ষ আরম্ভ। এ বৎসরের দুই জন প্রসিদ্ধ লেখকের দুই-খানি নূতন উপন্যাস, একখানি ইউরোপীয় উপন্যাসের অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি মানসে সমগ্র মানবতার ভাবধারায় উদ্দীপিত বহু চিন্তাশীল ও সৌন্দর্য্যসাধক লেখকের রচনায় কল্লোল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

আপনি কল্লোলের গ্রাহক হইয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন।

'কল্লোল' পত্রিকার বিজ্ঞাপন

২

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর চেয়ে বই পড়ার দিকে ঝোঁক। আমার পৈতৃক বাড়ি বহরমপুর শহরে, বাল্য কেটেছে সেখানেই, প্রথম স্কুলে যাওয়াও সেখানেই। আমার ঠাকুরদা মণীশ ঘটক, 'কল্লোল' যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখতেন। আমি যখন জন্মাই, তাঁর বয়স হয়েছে, নিয়মিত লেখালেখিও ততটা করতেন না। কিন্তু তাঁর বৃত্তে সমসাময়িক ও নতুন প্রজন্মের নানা কবি ও সাহিত্যিকের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তাঁদের অনেকেরই কথা পারিবারিক সূত্রে শোনা, আর আমার নিজের মনে আছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। পরবর্তী জীবনে শঙ্খ ঘোষ এবং মতি নন্দীর সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁদের কাছে দাদুর কথা শুনেছি। আমার ঠাকুরমা ধরিত্রী দেবী ঢাকার সুপরিচিত চৌধুরীবাড়ির মেয়ে, তাঁর বড়দাদা 'ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শচীন চৌধুরী, আর ছোটভাই বিখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। ঠাকুরমাও অল্প বয়সে গল্প লিখতেন, অনুবাদ করতেন। 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরত শুনেছি, আমি তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলাম। ঠাকুরমা প্রৌঢ় বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান, অথচ বই পড়া তাঁর একমাত্র নেশা। তাই বছর চারেক বয়স থেকেই তাঁকে বই ও খবরের কাগজ পড়ে শোনানো আমার দায়িত্ব ছিল। আমাদের বাড়িতে দেওয়ালজোড়া বইয়ের আলমারি আর তাক। তাতে শুধু বাংলা বই নয়, প্রচুর বিদেশি সাহিত্যের সংগ্রহ ছিল। এবং শুধু ক্লাসিক্স নয়, সমসাময়িক ডিটেকটিভ গল্প, থ্রিলার, বা রম্যসাহিত্য (এমনকী, ম্যাড ম্যাগাজিন) সবই ছিল। পড়ি কিংবা না-পড়ি, তন্ময় হয়ে বই ঘাঁটার অভ্যেস আমার বছর তিন-চার থেকেই। আমার মায়ের পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়, ছুটি কাটত সেখানে। দাদামশাই শ্যামল চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু তার আগেও দীর্ঘকাল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার ছিলেন। ভবানীপুরের সেই বাড়িতেও দেওয়ালজোড়া বইয়ের আলমারি। তবে তাতে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতির সিরিয়াস বইয়ের অনুপাত ছিল বেশি, তাই তাদের রং, প্রচ্ছদ ও আয়তন ছাড়া ছোটবেলায় আর খুব একটা কিছু রেখাপাত করেনি। কিন্তু আমি তাঁর অত্যন্ত পেয়ারের বড় নাতি হওয়ায় আমার প্রায় প্রতিদিনের রুটিন ছিল দাদুর সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়ে পাড়ার বইয়ের দোকানে বই ঘেঁটে সময় কাটানো। নিয়মিত একটি-দু'টি গল্পের বই হাতে করে বাড়ি ফেরা। দাদু আর আমার অলিখিত বোঝাপড়া ছিল। কারণ এটা অনেক সময়ই করা হত আমার কড়া শাসনপন্থী মায়ের চোখ এড়িয়ে।

এই বইঘেরা শৈশবে নেহাতই শিশুপাঠ্য বাদ দিয়ে প্রথম যে লেখকদের ছোটদের জন্য লেখা বই পড়ার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে—তা হল উপেন্দ্রকিশোর, বিভূতিভূষণ, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষ প্রিয় ছিল উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের মহাভারত', ইলিয়াড-ওডিসির বাংলা অনুবাদ, বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' আর অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'। তখনও বিদেশি সাহিত্যের মূলত অনুবাদই পড়তাম। তার মধ্যে ছিল কোনান ডয়েল, জুল ভার্ন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, মার্ক টোয়েন। আর ছিল 'প্রগতি প্রকাশনা'-র নানা বই, যার মধ্যে 'গল্প আর ছবি' আর 'রুশদেশের উপকথা' বিশেষ করে মনে পড়ে। আস্তে আস্তে ভাললাগার লিস্টে ঢুকল সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়ের লেখা; যথাসময়ে পরশুরাম ও শরদিন্দু আবিষ্কার করে জীবনজোড়া মুগ্ধতা তৈরি হল।

কৈশোরের তন্ময় ও নিরাপদ মায়াকানন থেকে যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ও ভাবনার জগতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এল। গল্প-উপন্যাস পড়ার লিস্ট প্রাপ্তবয়স্ক হতে শুরু

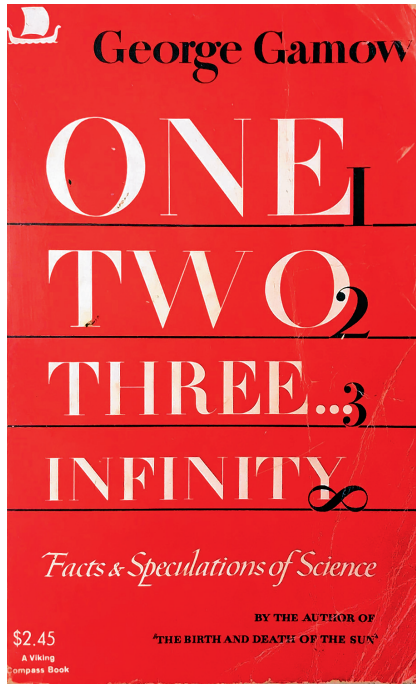

পাঠভবন স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক পিনাকী মিত্র। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, 'ঈশান স্কলার' ছিলেন; আবার সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সিনেমা— সব ব্যাপারে প্রবল উৎসাহী। তাঁর প্রভাবে অঙ্ক বিষয়টিকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করলাম।

করল— যার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিভূতিভূষণ-প্রীতি 'চাঁদের পাহাড়' ছেড়ে 'পথের পাঁচালী' হয়ে 'আরণ্যক'-এ পা দিল, আর তার সঙ্গে বাংলা ও বিদেশি সাহিত্যের ক্লাসিক্স এবং সমসাময়িক লেখকদের লেখা গোগ্রাসে পড়ার অভ্যেস শুরু হল। পরশুরামের ভাষায় চিন্তাজগতের যৌবনকুঞ্জে পাখিরা কা কা করে উঠল, তবে তারা শুধুই কোকিল (অর্থাৎ, রোমান্টিক— যদিও শুধু প্রেম-অর্থে নয়, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ধরে নিয়ে) ছিল না। বয়সোচিত 'angst' বা বিপন্ন বিস্ময়ের ছায়াও ছিল। একদিকে বৃহত্তর সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করল, যখন প্রথম অসাম্য, দারিদ্র, ও বঞ্চনার কার্যকারণ বোঝার এবং সমাধানের হদিশ খোঁজার চেষ্টার শুরু, যদিও এখন ভাবলে সেই চিন্তার অনেকগুলোই অপরিণত মনে হয়। অন্যদিকে বৃহত্তর জগৎ এবং অস্তিত্ব নিয়ে নানারকম দার্শনিক চিন্তায় মাথা আচ্ছন্ন হয়ে থাকত— যেমন, 'অসীম', 'অনন্ত', 'চিরন্তন' এই ধারণাগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সময় মাথা গুলিয়ে যেত। যেমন, এই মহাবিশ্বের শেষ কোথায়, আর যেখানে শেষ সেখান থেকে কীসের শুরু? সময়ের অর্থ কী? সময়ের শুরু কখন, শেষ-ই বা কখন? আমাদের চারপাশের জগৎ পরিবর্তনশীল না হলে— সবকিছু যদি স্থির, অপরিবর্তিত থাকত, যদি এভাবে দিন-রাত না হত, আমাদের বয়স না হত, তাহলে কী মানুষ সময় বলে ধারণাটার উদ্ভাবনা করত? আমাদের নশ্বর অস্তিত্বের কোনও কিছুই কি আছে, যা চিরন্তন? এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের চেতনার জগৎ— আমরা কী ভাবি, কেন ভাবি, কী মনে রাখি কী ভুলে যাই, কী কল্পনা করি, কেন কল্পনা করি— সে-ও যেন এক অন্তর্লীন মহাবিশ্বের মতো অনন্ত ও রহস্যময়। এগুলো নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে বেশি সাহস হত না আর বাম ও প্রগতিশীল পারিবারিক পরিবেশে বড় হওয়ায় প্রথাগত ধর্ম বা আধ্যাত্মিক চিন্তা ততটা আকর্ষণ করত না।

৩

এই সময়ে চিন্তাজগতে একই সঙ্গে দু'টি নতুন দিগন্তের উন্মেষ হল। একটি হল এক প্রবল কাব্যপ্রীতি, যাকে নেশা-ই বলা চলে, ভর করল। আর অন্যটি হল 'অঙ্ক' বিষয়টিকে নতুন চোখে দেখা, এবং আস্তে আস্তে তার রহস্যময় ও সুন্দর জগতে প্রবেশ করা শুরু হল।

কাব্যপ্রীতির মূলে ছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতা। তাঁর কবিতায় সময়চেতনা, মহাবিশ্বের অনন্ত ও অসীমতা, এবং আমাদের নশ্বর ও আপাততুচ্ছ জীবনের এক-একটি মুহূর্তের দৃশ্য-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ মাখা তাৎক্ষণিক সংবেদন আর তার সঙ্গে ইতিহাসের মহাসাগরে আমাদের কালোত্তীর্ণ ও অবিনশ্বর চেতনার অনন্ত স্রোতের দোলাচল ভাবনার জগতে একটা প্লাবন এনে দিল। 'হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে', 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি', 'বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন/ কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,/ অথবা মাটির দিকে—পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে/ মিশে গিয়ে', "অনন্ত জীবন যদি পাই আমি তাহ'লে অনন্তকাল একা/ পৃথিবীর পথে আমি ফিরি যদি দেখিবো সবুজ ঘাস ফুটে উঠে/ দেখিবো হলুদ ঘাস ঝরে যায় দেখিবো আকাশ শাদা হয়ে উঠে ভোরে—" এসব পঙ্‌ক্তি মন্ত্রের মতো গেঁথে গেল মনের মধ্যে। শুধু জীবনানন্দ নয়, টি. এস. এলিয়ট (Time present and time past/ Are both perhaps present in time future/ And time future contained in time past... Footfalls echo in the memory/ Down the passage which we did not take/ Towards the door we never opened/ Into the rose-garden...), অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়— এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু কবিতা কবিতা-আচ্ছন্নতার এই পর্যায়ে নিত্যপাঠ্য ছিল। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বেশি পড়া হয়নি তখনও, রবীন্দ্রকাব্যে অনুরাগ জন্মায় অনেক পরে, প্রবাসী জীবনে।

১৬ বছর বয়সে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার সময় কোনও একটা রাস্তা বেছে নেওয়ার মুহূর্ত এল, এবং সেখানে এলোমেলো কুয়াশাময় চিন্তাজগৎ

জীবনানন্দ দাশ। আমার কাব্যপ্রেরণার শিকড়

‘সোনার কেল্লা’র শুরুতে ফেলুদা যেমন সবকিছুর মধ্যেই জিয়োমেট্রি আছে বলে তোপসেকে বুঝিয়েছিলেন, আমিও গল্প-উপন্যাসের প্লট থেকে বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতিতে গাণিতিক কাঠামোর ছায়া দেখতে শুরু করলাম।

আমাকে কোনও নির্দিষ্ট দিশা দেখাচ্ছিল না। সাহিত্য বা দর্শনের প্রতি অনূঢ়া— তাই কলাবিদ্যার দিকে যাব;না কি রাজনীতি-অর্থনীতির দিকে ঝোঁক বলে সমাজবিজ্ঞানের দিকে যাব? জানতাম ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়র হতে চাই না, যদিও বিজ্ঞান সম্পর্কেও উৎসাহ ছিল। এই সময়ে আমার স্কুলের এক শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে এই সংকট-নিরসনের একটা নির্দিষ্ট দিশা খুঁজে পেলাম। কলকাতার পাঠভবন স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক পিনাকী মিত্র। পিনাকীদা অঙ্কের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, ‘ঈশান স্কলার’ ছিলেন; আবার সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সিনেমা— সব ব্যাপারে প্রবল উৎসাহী। তাঁর প্রভাবে অঙ্ক বিষয়টিকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করলাম। আমি ছোটবেলায় অঙ্ক পারতাম, কিন্তু খুব একটা ভাল লাগত না। কিন্তু ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হওয়ার পর হায়ার সেকেন্ডারিতে অঙ্ক পড়তে শুরু করার কয়েক মাস বাদে শীতকালের এক সকালে যখন নরম রোদ কলকাতার ধোঁয়াশা ভেদ করে পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে লাজুক উঁকি দিচ্ছিল, বুঝলাম আমার অন্তর্জগতে একটা বিশাল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, আমি অঙ্কের প্রেমে পড়েছি! প্রিয় কবিতার বই ডেস্কে ছড়ানো, বুকমার্ক দেওয়া রাসেলের ‘হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি’, বামপন্থী অর্থনৈতিক ইতিহাসের বই, কিন্তু মন চলে যাচ্ছে ক্যালকুলাসের লিমিট, কন্টিনিউইটি আর পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রোবাবিলিটি থিওরির দিকে।

সবাই ভাবল এ এক নতুন খামখেয়াল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম এ কোনও সাময়িক ভাল লাগা নয়, জাদুচশমা পরে যেমন আপাত-অদৃশ্য অনেক কিছু দেখা যায়, সেরকম আমার অঙ্ক ভাললাগার আসল কারণ অঙ্ক আমাকে এমন একটা ভাষার সন্ধান দিল, যাতে আপাত-পিচ্ছিল ও বিভ্রান্তিকর নানা ধারণা ও বক্তব্য আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিভাত হয়ে উঠতে থাকল।

‘অনন্ত’ বা ‘অসীম’ শব্দগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করলে এর আগে মাথা ঘোরার অনুভূতি হত। জর্জ গ্যামো-র ‘ওয়ান, টু, থ্রি... ইনফিনিটি’ বইটিতে এটা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে, পিনাকীদার কাছে সেটা শুনে আমার প্রথম মনে হতে শুরু করে যে, অঙ্ক ব্যাপারটা যতটা রসকষহীন মনে হয়, ততটা তো নয়। ধরা যাক, এমন একটা হোটেল আছে যেখানে ঘরের সংখ্যা অগণিত। হোটেলের নামটাও ভাবা যাক সেরকমই— অনন্ত হোটেল! মুশকিল হল, একজন নতুন অতিথি এসেছেন আর হোটেলের ম্যানেজার তাঁকে বললেন, আমাদের সব ঘরেই লোক আছে, তাই জায়গা নেই। তখন অতিথি, যিনি অঙ্কের মাস্টারমশাই, বললেন আপনি ১ নম্বর ঘরের অতিথিকে ২ নম্বর ঘরে সরিয়ে দিন, ২ নম্বর ঘরের অতিথিকে ৩ নম্বর ঘরে,

৩ নম্বর ঘরের অতিথিকে ৪ নম্বর ঘরে, এবং এরকম করতে থাকলে, সব পুরনো অতিথিই নতুন ঘর পেয়ে যাবেন (এবং সেটা তাঁদের আগের ঘরের পাশেই হবে) আর ১ নম্বর ঘরটা নতুন অতিথিকে দিয়ে দেওয়া যাবে। গল্পটার মজাই হল যে, এমন তো করা যায় না, কারণ ঘরের সংখ্যা অনন্ত বাস্তব জীবনে কী করে হবে? হোটেলে ঘর তো আর মহাকাশের তারার মতো নয়।

কিন্তু 'অনন্ত' ব্যাপারটা যে রহস্যময় অথচ অঙ্কে সেটাকে সুন্দর করে ধরা যায়, সেটা এর থেকে বোঝা যায়। শুধু অনন্ত শব্দটির মধ্যে এটা ধরা পড়ে না। আসলে, অনন্ত বা অসীম হল আমাদের জানার বা পরিমাপ করার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার ধারণামাত্র। একটা পিঁপড়ের কাছে যে পথ দেখে মনে হবে অনন্ত, আমাদের কাছে সেটা মাত্র দশ মিনিটের ড্রাইভ। এটা বোঝার পরে আমার অনন্ত বা অসীম শুনলে মাথা গুলিয়ে যাওয়ার অনুভূতি কখনও হয়নি, মহাবিশ্বের রহস্য রহস্যই থেকে গিয়েছে, কিন্তু সেটা নিয়ে কীভাবে ভাবব, সেই ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেরকম, ক্যালকুলাসে আর-একটা অসাধারণ ধারণা হল, অণু-অনন্ত (infinitesimal)। শূন্য থেকে একের মধ্যে আছে অর্ধেক, শূন্য ও অর্ধেকের মধ্যে আছে এক-চতুর্থাংশ, এবং এভাবে ভাবতেই থাকা যায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশের কথা— এখানেও এক অনন্ত সারি আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অনতিক্রম্য। ভাবুন সিনেমায় স্লো মোশনের কথা— ক্যামেরার গতি যত ধীর হবে, দু'টি জিনিস যেন কাছে এসেও এক হতে পারবে না। 'চারুলতা'-র শেষ দৃশ্য মনে করুন— ভূপতি ও চারুলতা পরস্পরের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, হাত দু'টি কাছাকাছি আসছে, কিন্তু খুব কাছে এসেও যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সেখানে ক্যামেরা স্থাণু হয়ে গেল। যখন গণিতের সঙ্গে শিল্পের এই তুলনাটা মনে হল, তখন মনের মধ্যে অনেক দিন ধরে জমে থাকা কুয়াশা যেন এক লহমায় কেটে গেল।

অঙ্ক যে আসলে এক শক্তিশালী ভাষা, যা দিয়ে নানা বিমূর্ত ধারণাকে সাবয়ব করা যায়, এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, কী হলে কী হবে— এই ধরনের অনুমান গঠন করা যায়, নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়, এই উপলব্ধি আমার চিন্তার জগতে একটা বড় পরিবর্তন এনে দিল। 'সোনার কেল্লা'-র শুরুতে ফেলুদা যেমন সবকিছুর মধ্যেই জিয়োমেট্রি আছে বলে তোপসেকে বুঝিয়েছিলেন, আমিও গল্প-উপন্যাসের প্লট থেকে বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতিতে গাণিতিক কাঠামোর ছায়া দেখতে শুরু করলাম। কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হওয়ার সন্ধিক্ষণে এই যে পথ হাঁটা শুরু হল, তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি তা পরবর্তী জীবনে আমাকে অর্থনীতির গবেষণার জগতে নিয়ে গেল, যেখানে কোনও তত্ত্বের কাঠামো গাণিতিক ভাষায় গড়ে তুলতে হয়।

কলকাতার এক শীতের সকালের সেই স্মৃতি এখনও আমার কাছে মাইলফলক হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেটা 'বড়দিন'-ই ছিল আমার কাছে।

এখনও সেই মুগ্ধতা কাটেনি।

পত্রভারতীর নতুন নতুন বই

সমরেশ মজুমদার
সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে সম্পূর্ণ উপন্যাস
উজাড় 199/-
গল্প সমগ্র ১ 550/- হায় সজনি 225/-
আগুনবেলা 399/- সমরেশের সেরা ১০১ 850/-
কলিকাতায় নবকুমার সম্পূর্ণ 595/-
হারিয়ে যাওয়া লেখা 490/- কথামালা 325/-

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণদেব ও মা সারদার সমস্ত লেখার সম্ভার
ঠাকুর মা সমগ্র 1200/-
উপন্যাস সমগ্র ১, ২ 599/- ও ৩ 549/-
হারিয়ে যাওয়া লেখা 749/- বড়দের হাসি সমগ্র 725/-
মাপা হাসি চাপা কান্না অখণ্ড 749/-

হেমেন্দ্রকুমার রায়
অখণ্ড সংস্করণে
কিশোর ভৌতিক সমগ্র 799/-
রহস্য-রোমাঞ্চ সমগ্র 699/- রবিনহুড 150/-
কিশোর ভৌতিক সমগ্র ১,২,৩
১ম 299/- ২য় 350/- ও ৩য় 299/-

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
ভয়ংকর ভয়ের বিশাল উপন্যাস
জলঙ্গীর অন্ধকারে 350/-
সাদা বিড়াল 299/- জীবন্ত উপবীত 249/-
মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি 225/- কর্ণসুবর্ণর কড়ি 299/-
চন্দ্রকলা ও চন্দন পুরুষ 325/- বন্দর সুন্দরী 350/-
সোমনাথ সুন্দরী 395/- খাজুরাহো-সুন্দরী 325/-

অর্পিতা সরকার এসো না অসময়ে 375/-

অভীক সরকার
বাংলার ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণের
পটভূমিকায় অসামান্য বিশাল উপন্যাস
পটমঞ্জরী 399/-
পেতবথু 225/- খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ 150/-

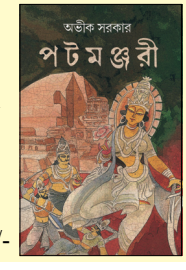

কলকাতা ৩/১ কলেজ রো Phone : +91 33 22411175
বর্ধমান ৭৫ বি সি রোড, বড়বাজার Ph : +91 94343 91296
কৃষ্ণনগর চক্রবর্তী কমপ্লেক্স, উকিল পাড়া Ph : +91 9609843080
জলপাইগুড়ি আর্যাবর্ত কমপ্লেক্স, ডিবিসি রোড Ph : +91 7029259922
www.patrabharati.com e-mail : info@patrabharati.com
হোয়াটসআপ 9830806799 9433075550